ড. মুকিদ চৌধুরী

কথাকলির একটি মানচিত্র

'পেছন ফেরে তাকাতেই দেখলাম তার আঁখিতে প্রজাপতির নাচন।'
– পরদেশে পরবাসী, অবদুর রউফ চৌধুরী।

একটি মহৎ শিল্প যেমন বহুগুণের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে থাকে, ঠিক তেমনি দ্রোহী কাথাসাহিত্যিক আব্দুর রউফ চৌধুরীর 'পরদেশে পরবাসী'-ও একটি বহু শৈল্পিক গুণের সমষ্টি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এক একজন পাঠকের কাছে তা একাধারে উপন্যাস, ইতিহাস, সাহিত্য সমালোচনা, জীবন-কথা এবং বিশেষভাবে সংস্কারবাদী দর্শন-চিন্তা বলেও সমাদৃত হতে পারে।

রউফ প্রবাস-বাটির বহির্দেশ ও অন্তর্দেশ জুড়ে অবস্থা নিয়ে প্রবাসবাসীদের বাইরের জীবনের সঙ্গেঢুকে গেছেন তাদের অন্তর্লোকে। প্রবাস-বাসের কাহিনী এ গ্রন্থে থাকলেও তার স্বরূপ উদঘাটনে কখনোই লেখকের মূল লক্ষ্য নয়, বিলেতকে পটভূমি হিশেবে ব্যবহার করে জীবনের ও মানুষের গভীর রহস্যেদ্ঘাটনই লেখকের উদ্দেশ্য।

ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস সম্বন্ধে পণ্ডিতরা বলেছেন যে, জীবনের সংঘাতময় আবর্তনকে মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসে এবং যৌক্তিক পরস্পরায় ঘটনার ক্রম নির্ধারণেই ঔপন্যাসিকের সার্থকতা। দৈনন্দিন জীবনের চিন্তা-চাঞ্চল্য ও প্রবাহমানতাকে তুলে ধরাই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। লেখকের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন ও জীবনানুভূতি কোন বাস্তব কাহিনীকে অবলম্বন করে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে পরিণত হয়, তা-ই উপন্যাস নামে পরিচিত। উপন্যাসে সাধারণত যে পাঁচটি বিশেষ অবস্থা থাকে সেগুলি হচ্ছে– ১. প্রস্তাবনা, ২. সমস্যার উপস্থাপনা, ৩. আখ্যানভাগের মধ্যে জটিলতার প্রবেশ, ৪. চরম সংকট মুহূর্ত ও ৫. সংকট বিমোচন বা উপসংহার। এ-সব দিক থেকে বিবেচনা করলে 'পরদেশে পরবাসী' অবশ্যই একটি উপন্যাস। যা বিশ্ব মানব-জাতির জীবন বিন্যাসে রচিত। 'বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগে সত্যের আলো-ছায়ায় বসে' লেখা একটি উপন্যাস।

মানুষকে ভালোভাবে বাঁচতে হলে উপন্যাসের প্রয়োজন। যে উপন্যাস যুগকে স্বীকার করতে পারে না, মানুষের যন্ত্রণা বুঝতে পারে না, তা উপন্যাস হতে পারে না। ঔপন্যাসিক হলেন সমাজের যাজক স্বরূপ, আর উপন্যাস হল বাস্তব জীবনের দর্পন। তাই 'পরদেশে পরবাসী'-তে যৌনতা ও জীবন হাতে হাতে ধরাধরি করে মানুষের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন রউফ। ফলে রউফ শব্দশিল্পী হিশেবে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন একজন মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতীক হিশেবে।

'পরদেশে পরবাসী' ধারাবাহিকভাবে 'ইংল্যান্ডের দিনগুলি' নামে প্রকাশিত হয় 'যুগভেরী' পত্রিকায় ১৯৯৪ সালে। ১৯৮৯ সালে বৃটিশ ডাক বিভাগ থেকে অবসর নিয়ে আব্দুর রউফ চৌধুরী হবিগঞ্জে চলে এলে এখানে বসেই ১৯৯৪ সালে এ উপন্যাসের পরিবর্ধিত ও সংশোধিত করে নাম দিয়েছেন 'পরদেশে পরবাসী'।

'পরদেশে পরবাসী' কোনো অর্থেই রাজনৈতিক উপন্যাস নয়; যদিও এর আনাছে-কানাছে রাজনৈতিক ঘটনার ছবি পরিস্ফুটিত। এ হচ্ছে 'বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগে সত্যের আলো-ছায়ায় বসে রচিত' একটি উপন্যাস। 'সাধারণ মানুষ নিয়ে সাধারণ জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র' যা ক্রমশ স্পষ্ট হবে এই আলোচনায়। রউফের এই উপন্যাসে বাস্তবতার ছাপ যেমন পাওয়া যায় তেমনি বাস্তবতাকে পাওয়া যায়

প্রসারিত ও প্রতিফলিত আকারে। এখানে বাস্তবতা হয়ে উঠেছে হৃদয় ছোঁয়া। যে-কোনো শিল্পকর্মে, উপন্যাসেও বটে, বাস্তবতা যেমন মূল্যবান তেমনি মূল্যবান কল্পনাও। তবে 'পরদেশে পরবাসী'তে কল্পনার প্রবণতার দিকটা কিছুটা কম থাকায় প্রবাহমান জীবন তথা বাস্তবতার ব্যবহার স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রউফ স্বতন্ত্র তাঁর আশ্চর্য কল্পনা শক্তিতে ও তার ব্যবহারে। এখানে কল্পনার সঙ্গেমিশে গিয়েছে বাস্তবতা; যা একটি লক্ষ্য স্থির করে। স্থির হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদে, বাংলাদেশের সৃষ্টির প্রয়োজনীতায়। তাই বলা যায় যে, রউফ যেমনি বস্তববাদী শিল্পী ঠিক তেমনি কল্পনাবাদী শিল্পীও বটে। রউফ যে-ভাবেই তাঁর ভাবনাকে সাজান না কেন 'পরদেশে পরবাসী'- গ্রন্থের ভিতটা ঠিকই গেঁথেছেন খাঁটি বাস্তবতায়।

রউফ আত্মচেতন শিল্পী— তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তব সমস্যার সমাধান খুঁজতে তিনি সৃষ্টি করেছেন একদিকে মানুষের বহির্জগতের চিন্তা-চাঞ্চল্য ও প্রবহমানকে— জীবনদ্বন্দ্বের প্রচেষ্টা তার অনুশীলন; অন্যদিকে মানুষের আদিম বৃত্তিগুলির যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ। এজন্যই রউফ অন্য সাহিত্যধর্মী বা কল্পনাধর্মী ঔপন্যাসিকদের চেয়ে আলাদা। রূপমিয়া, ফারনিন, ছোটমামা, মইন, দিলদার, জাবেদ, মীনা, নাসরিন চরিত্রের মধ্য দিয়েই এসব বিষয়াদির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। উপন্যাসের সবগুলি চরিত্র ক্রমচলিষ্ণু ও অন্ত ঃপরিবর্তিত এবং তাদের প্রত্যেকের আছে সুস্পষ্ট পরিণাম— রূপমিয়া ও ফারনিনের বন্ধুত্ব স্থাপন, নাসরিন ও তার স্বামীর বন্ধুকে ঘিরে সমস্যা, মইন ও মীনার নতুন করে ঘর বাঁধার উদ্যোগ, রূপমিয়ার নিজের সমস্যা সমাধানের জন্য বারবার বাস পরিবর্তন প্রভৃতি। 'পরেদেশে পরবাসী' উপন্যাসের ঘটনাঘন চরিত্রগুলির প্রবাস-জীবনের উথালপাথাল ঢেউয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। নিজেদের নিঃসঙ্গতার বৃত্তে ভ্রাম্যমাণ কয়েকটি মানুষ অন্যদের বৃত্তগুলি স্পর্শ করে, কাছে আসে, আবার দূরেও চলে যায়। রউফের 'অনিকেতন' [সাম্পন ক্রুস] উপন্যাসের অসংখ্য চরিত্রের মতই এরা অস্থির ও সন্ধানী, শান্তিহীন ও অসুখী, সামন্ত-স্বার্থ ও ব্যক্তি-স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত। ঝড়ো ঘটনাবলীর পরে একটি প্রশান্তির ছায়া নেমে আসে; একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্যেরই দ্যোতকতা। অতএব, সব মিলে 'পরদেশে পরবাসী' রউফের অন্যতম সফল ও গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস।

অনেকগুলি বিভিন্ন ও কিছু বিচ্ছিন্ন চরিত্র নিয়ে 'পরেদেশে পরবাসী' উপন্যাসের আখ্যায়িকা গড়ে উঠেছে। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই তাদের অসামান্য স্বতন্ত্র নিয়ে উপস্থিত। চরিত্রগুলি প্রায় সবই চণিষ্ণু ও অন্ত ঃপরিবর্তমান। এই চরিত্রগুলি নিজেদের এবং তারচেয়ে বেশি পরস্পরের সঙ্গেসংঘর্ষ-সংঘট্টে, একটি পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়ে চলছে। রূপমিয়া, ছোটমামা, মইন, দিলদার, মীনা, ফারনিন, নাসরিন— সবগুলি চরিত্রের মধ্যেই আকর্ষণ-বিকর্ষণের অবিরল দোলাচল কাজ করছে। কিন্তু এদের প্রত্যেকের জীবনদর্শন ও জীবনকে মোকাবিলা করার পদ্ধতি ও পরিণাম স্বতন্ত্র বলে চরিত্রগুলি স্বতন্ত্র আলোচনাসাপেক্ষ।

চরিত্রচিত্রণ

রূপমিয়া—

রূপমিয়া 'পরদেশে পরবাসী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। প্রথম অধ্যায় থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত তাকে ঘিরেই ঘটনার আবর্ত, প্রবাহ ও মোহনা চলে। রূপমিয়ার বিগত গৃহ-জীবন সম্পর্কে ইশারা ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম-পাকিস্তানের চক্করকোট পাঠান পল্লীতে শুরু হয়েছিল তার প্রায় দশ বছরের সংসার-জীবন। সেখানেই তার দু'সন্তানের জন্ম। তারপর স্পষ্টই বলা হয়েছে কেন সে প্রবাস-জীবনে প্রবেশ করে, সেই গৃহিণী বা সন্তানরা কোথায়— এসব তথ্য আমরা জানতে পারি উপন্যাসের ক্রম-পত্তনের মাধ্যমে। তবে রউফ রূপমিয়া নামে এক ব্যক্তির জীবনের কিছুটা অংশই আমাদের কাছে শুধু তুলে ধরা

হয়েছে— তার সুদূর অতীত সম্বন্ধে আমাদের তেমন সুস্পষ্ট ধারণা নেই; কেবল খানিকটা অনুমান করিয়ে দেয়া ছাড়া; রূপমিয়ার ভবিষ্যৎও আমাদের অজ্ঞাত থেকে যায়, অনুমানও করা সহজ হয় না।

রূপমিয়াকে আমরা প্রথম দেখতে পাই 'হিথরো বিমান বন্দরে অবতরনের জন্যে যখন পি.আই.এ. এরোপ্লেন চক্কর দিচ্ছে' ঠিক তখনই। 'লন্ডন নগরীকে' যেন 'আলোর তরঙ্গে সজ্জিত' করা হয়েছে রূপমিয়ার আগমনের উদ্দেশ্যে। রূপমিয়া ভাবে— 'স্বপ্নের শহর [...] আলোর শহর— বিয়ে বাড়ি যেন। বরের আগমন প্রতিক্ষায়। বরেরও কত কল্পনা থাকে মন জুড়ে। বাস্তবের সঙ্গেমিলে কি না তা নিয়ে তার ভাবনা নেই। নিছক কল্পনার মাঝেও আনন্দ আছে।' মন ভরা স্বপ্ন নিয়ে রূপমিয়া আসে লন্ডনে। দারিদ্র্যতা আর অভাবের বিরুদ্ধে তার অবরুদ্ধ দ্রোহ-ক্ষুধাকে জাগ্রত করতে। কেননা 'পরনির্ভরশীল না-হওয়ার যে-সংকল্প ছোটবেলা থেকে' পেয়েছিল 'ঘাত-প্রতিঘাতে আত্মীয়-স্বজনের কাছে সাহায্যের আবেদন প্রত্যাখান হবার ফলে' সে অভিমান এখনো ক্ষুব্ধ অন্তরে দানা বেঁধে বহিঃপ্রকাশ করছে তার মাঝে।

রূপমিয়া নতুন লন্ডনে এসেও মাস্টারের আদর্শবাদের ঝোঁক তার অন্তর থেকে ধুয়েমুছে ফেলতে পারেনি। তার ইচ্ছা প্রবাসে এসে তার আর্থিক উন্নতী সাধন করা আর তার সঙ্গেপ্রবাসী মানুষের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার ও অশিক্ষার মধ্যে তিলে তিলে বিজ্ঞানের আলো বিলিয়ে সুস্থ জীবন গড়ে তোলা। কারণ, 'কুসংস্কারগুলিই তো অনেকাংশে দায়ী আমাদের অধঃগতির জন্যে।' কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার সংস্কার প্রচেষ্টা প্রবাসী বাঙালি সমাজের উপর কতটুকু দাগ কাটে তা-ই এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। রূপমিয়া কিন্তু একটি সত্য আবিষ্কার করেছে— যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেচনা দ্বারা মানুষ চালিত হয় না। কুসংস্কার যুক্ত মানুষের মন যেন একটি মরা নদীর মত; 'সমুদ্রের সঙ্গেনদীর যোগাযোগ বিনষ্ট [...] বৃহত্তের সঙ্গে চুটল সম্পর্কের পরেছে ছেদ।' বিজ্ঞানের যুক্তিগুলি তার দেওয়ালে ঘা খেয়ে ফিরে যায়। 'জ্ঞান-সমৃদ্ধ-যুক্তি যেখানে অচল, সেখানে চলার সকল পথ বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য।' তাছাড়া 'মানুষ জন্ম থেকেই পরশ্রীকাতর, সংকীর্নমনা আর হিংসুটে হয়। শিক্ষা ও পরিবেশ পশু মনোবৃত্তিকে সংযত করে শিশুকে মানুষ করে তুলে।'

পাকিস্তান আমলের রাষ্ট্রভীতি ও সমারাস্ত্র-শাসিত সমাজ-জীবনের অন্তর্ময় রূপ বিধৃত হয়েছে রউফের 'পরদেশে পরবাসী' উপন্যাসে, রূপমিয়ার মাধ্যমে। বিভাগোত্তর দেড় দশকেরও অধিকালব্যাপী বাঙালির প্রবাসজীবনের রূপরূপান্তর, মানুষের অস্তিত্ববিষয়ক উদ্বেগ এবং সময় ও সমাজের ক্ষতবিক্ষত অনুভূতিপুঞ্জের বিন্যাসে রউফের সাফল্য বিস্ময়কর। এই উপন্যাসের নায়ক রূপমিয়ার অভিজ্ঞতালোক, আত্মজিজ্ঞাসা ও সত্যসন্ধানের মাধ্যমে একটি কালের সমষ্টি-অস্তিত্বের সমগ্র রূপ উন্মোচিত হয়েছে। এ-উপন্যাসের উপকরণ প্রবাসজীবন কাঠামো থেকে গৃহীত হলেও বিষয়ভাবনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব-জীবন-চৈতন্যের মর্মমূলস্পর্শী। রূপমিয়ার আর্থ-পরিস্থিতি, মানসগঠন, পেশাগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি থেকে বাঙালির প্রবাসজীবনের পরিবর্তনশীলতার অন্তঃশীলারূপ অনুধাবন করা সম্ভব। যেমন, রূপমিয়া নিজেকে বলে, 'জানি ঘরে বসে বিশ্রাম নেয়া আমার জন্য ঠিক হবে না। চাকরি যত তাড়াতাড়ি হোক খুঁজে বের করতে হবে। [...] অনটনের লাগাতার দাপট কেমন করে সামল দিব। দেশে মাস-মাইনে পেয়েও দিন কাটত না। আক্রাগণ্ডার দিনে ঘাটতি আর ঘাটতি। বকেয়া থেকে যেত দোকানে দোকানে। বাকির খাতায় নাম উঠাত দোকানিরা। ছয় টাকার জিনিস সাড়ে ছয় টাকা লিখত। ফুটো বালতির ভরসা কি! যা ফেলা হয় তা একবারেই শেষ হয়ে যেত। বাতিল মানুষটিকে কেউই তখন চিনে না। হতাশার পথে একমাত্র চাকরিই সম্বল। তাছাড়া চাকরি না পেলে মামাই আমার অন্নদাতা, রক্ষাকর্তা, দুর্দিনের অবলম্বন। [...] উপযুক্ত সুযোগের আশায় দারিদ্রতার বোঝা মাথায় নিয়ে ঘরে মধ্যে বসে সময় নষ্ট করতে পারি না। কাজ খুঁজে বের করতে হবে, যে-কোনও কাজ।'

প্রবাস-সমাজের বিচিত্র শর্তবন্দি ও শৃঙ্খলিত জীবন-পদ্ধতির অনুগামী হওয়াই রূপমিয়ার জন্য স্বাভাবিক। সময়, সমাজ ও জীবনের নিগূঢ় অনুভব থেকে রউফ সমকালের প্রাগ্রসর চেতনামূল স্পর্শ করেছেন। তাইত জীর্ণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও রূপমিয়া আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। অর্থনৈতিক কারণেই উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে স্কুলের সামান্য আয়ের চাকরি, পশ্চিম-পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে যোগদান ও পরে বিলেতে মামার আশ্রয়ে পরিতৃপ্ত থাকতে হয়েছে তাকে। কিন্তু এক অভূতপূর্ব ও মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ও তার প্রতিক্রিয়া রূপমিয়ার চেতনালোক ও জীবনমূলকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। সে আলোড়নে কেবল ব্যক্তিচিত্ত নয়, সমষ্টি, এমনকি প্রবাস-জীবনকেও প্রবলভাবে নাড়া দেয়। সমাজ-বিকাশের ধারায় রূপমিয়ার অতীত, বর্তমান ও সমকালের জীবন-রূপের মাধ্যমে গোটা সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্বাহিরের সমগ্রতা অভিব্যক্ত হয়েছে 'পরদেশে পরবাসী' উপন্যাসে।

ফারনিন—

ফারনিনের বিগত গৃহীজীবন সর্ম্পকে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। উপন্যাসের বেশ কিছুটা অংশ নিয়ে ফারনিনের ক্রমপত্তনই আমরা লক্ষ্য করি। ফারনিনের গৃহীজীবন সম্পর্কে কেবল একটিই ইশারা আছে, 'ভেবে পাই না কেন তার স্বামী তাকে ত্যাগ করার তাগিদ অনুভব করেছে। বড় আশ্চর্যের ব্যাপার!' ফারনিন সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে রউফ বলেছেন, 'দেববঞ্চিতা দেহ তার মাঝে মূর্ত হয়ে উঠেছে' আর 'বাঙালি নারীর চলনে-বলনে যে লাজ-নম্র-আড়ষ্টতা থাকে, তা সম্পূর্ণ বিপরীত আঁকারে ধারণ করেছে এই মেয়েটির মাঝে। যেন বেপরোয়া মনোভাব।' রূপমিয়ার প্রতি তার ক্রমাগত আকর্ষণ ও টেলিফোনের মাধ্যমে তাদের যুগল বন্ধুত্ব-বাঁধা জীবনের কথা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন রউফ। ফারনিনের সঙ্গেরূপমিয়ার বন্ধু-সম্পর্ক আকস্মিকভাবেই সৃষ্টি হয়। এই নারী হয় তো রূপমিয়ার অবরুদ্ধ ক্ষুধাকে জাগ্রত করে দিয়েছে। কেননা রূপমিয়া বলে—'অন্তরে এক অভূত-পূর্ব-আনন্দ নৃত্য করে উঠল। [...] বিশ ঊর্ধ্ব যুবতীর আবরণহীন মস্তকের সোনালী কেশ-পাল বাতাসে মাতাল। আমার উতলা অন্তরের সঙ্গেআড়ি যেন।' ফারনিন আত্মবিশ্লেষণশীল নয়— নিয়তি-তাড়িত; পুরোপুরিই নিয়তি-তাড়িত। তার অতীত আমাদের অজ্ঞাত— চাকরির সন্ধানে রূপমিয়া তার সন্ধান পায়। রূপমিয়া বলে— 'আমি চাই, তোমার তুলতুলে হাতের স্পর্শে আমার আলাদীনের প্রদীপ জ্বলে উঠুক। পাতাল পুরে রমার আগমনে রমরমা হোক ললাট।' রূপমিয়ার প্রতি ফারনিনের নারীরূপের গোপন ও দয়াময়ী আকর্ষণই এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। রূপমিয়া বলে, 'সে আমার দেহের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। শ্বাস-প্রশ্বাস অনুভূত হচ্ছে। তার সান্নিধ্য আমায় বিব্রত করে তুলল। আমার করণীয় কি— তা ভেবে ব্যাকুল।' ক্রমাগত রূপমিয়া ও ফারনিন একে অপরের দিকে ঝুঁকে। রূপমিয়া বলে, '[...] ফারনিন আমায় ডেকে পাঠাল। [...] সেক্রেটারির [ফারনিনের] কাছে যেতেই সে আঁতকে উঠল। [...] বলল— আঙুলটি দাও তো লক্ষ্মী। [...] ফারনিনের চোখে মিষ্টি-মধুর হাসি। চোখ ফেরানো দ্বায়।' অন্যত্রে রূপমিয়া বলে—'ফারনিন আমার নাক টিপে দিল। বেশ শক্ত করে খুব কাছে এসে। ভাবখানা যেন 'তব অঙ্গ লাগি কাঁদে মোর সর্বাঙ্গ।' ফারনিনের ভবিষ্যত আভাস অজ্ঞাত— কালস্রোতে ভেসে যাবে হয়ত। আমাদের জ্ঞাত দিনগুলি শুধু কেটেছে এক ঘোরের মধ্যে—'ফারনিনও আমার [রূপমিয়ার] প্রতি আসক্ত বলে মনে হচ্ছে।' ফারনিন বৌদি-ভাবী শ্রেণীভূক্ত নয়। অন্তত রূপমিয়া তা মনে করে না। বরং মনে করে—'স্বার্থ আদায়ের পরিকল্পনা নিয়েই আমি তার কাছে আসি।' অন্যত্রে বলা হয়েছে—'তার মত নারীকে নিয়ে হুরির কল্পনা করা হয়েছে কিনা কে জানে।' ফারনিন রূপমিয়ার সংস্পর্শে এলে সে বোধ করে তার মাঝে আশ্চর্য এক শারীরিক সম্মোহন—'পেছন ফেরে তাকাতেই দেখলাম তার আঁখিতে প্রজাপতির নাচন।' অন্যত্র বলা হয়েছে—'সে একটি ধীরস্থির পদক্ষেপ নিল; আমার [রূপমিয়ার] দেহের ওপর নিজেকে নিক্ষেপ করার ভঙ্গিতে।'

রূপমিয়ার মত ফারনিন ভিতর-সন্ধানী নয়, কিন্তু শান্তিহীন ও তাড়িত। জীবনের গভীর তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে যা শিখিয়েছে, তার প্রকাশ চমৎকার—'নীলকণ্ঠের সমুদ্র মন্থনের মত প্রেমঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মানবহৃদয় যেন।' আর 'তার আর্যতীক্ষণধার নাসিকা আমার ঈষৎ চাঁপা নাসাগ্রে এসে ঠেকাল প্রায়। তার পাতলা লিপিস্টিক রাঙা ওষ্ঠাধর আমার অধরকে ছুঁই ছুঁই করেও যেন ছুঁতে নারাজ।'

ফারনিন, রউফের আরো অনেক বিবাহিত নারীর মতই, অসুখী। সে যন্ত্রণায় জর্জরিত। ফারনিন ও রূপমিয়ার ক্ষতবিক্ষত জীবনের জন্যে আমরা বোধ করি না-বলা বেদনাই— এই বিমর্ষ, আশাহীন জীবনের ঢেউয়ে লুটোপুটি খাওয়া দু'টি মানুষ-মানুষী হয়ত অন্য কোনো স্থানে শান্তি পেতে পারত; কিন্তু এই উপন্যাসে রউফ সে-রকম স্থান রাখেননি। চাকরির উদ্দেশ্যে রূপমিয়া চলে যায় অন্য জায়গায়; 'লাস্যময়ী হাস্যলহরি' তুলে বিদায় নেয়। রূপমিয়া চেয়ে থাকে তার গমন পথে। তাদের সম্পর্ক থেকে যায় শুধু টেলিফোনের মাধ্যমে। রূপমিয়া সকলের উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্ন রাখে, 'দুটি সম্পর্কহীন নর-নারীর বন্ধুত্বের পরিণতি কি শুধু যৌন মিলনে?' তবুও রূপমিয়া বলে—'নতুন চাকরি আমাদের মধ্যকার সৃষ্ট সম্পর্কে কোন বাধা সৃষ্টি করবে না। করতে পারে না। আমাদের পরস্পর আনন্দ-দানের ব্যাপারটা ফোনে সংঘটিত। দূরালাপনীতে দূরত্ব তো কোনও সমস্যাই না। আমি নিয়মিত ফোন করব— যোগাযোগ অবশ্যই রক্ষা করব।'

ছোটমামা—

রূপমিয়া বলে— 'মামা সমবয়স্ক বলে আমাদের মধ্যে একটি বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।' ছোটমামা এক আশ্চর্য মানুষ। আচরণ পরিমিত, কথা স্বল্প, ব্যবহার ভদ্র ও মিষ্ট। তিনি একান্ত সাধারণ মানুষ। তার বিনয়, সহিষ্ণুতা, বিশ্বাসের শেষ নেই। তিনি রূপমিয়ার 'একরকম' বিরোধী চরিত্রের মানুষ; তবুও তার সঙ্গেরূপমিয়ার একটি সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতা আছে। তিনি রূপমিয়ার ছোটমামা। তিনি রূপমিয়ার অন্নদাতা, রক্ষাকর্তা, দুর্দিনের অবলম্বন। রূপমিয়া বলে, 'সাধারণ মানুষের প্রতি তার দ্বায়িত্ব ও ভালোবাসার অন্ত নেই। ফলে এ ধরনের বিচার-বৈঠকে মামার নাম ডাক অনেক। তিনি তুচ্ছ মানুষ নন। দশে মামাকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে। তার আশ্চর্য সহিষ্ণুতা, বিনয় আর বিশ্বাসের ফলে তাকে ব্রিকলেন অঞ্চলের প্রবাসীরা বানিয়েছে দশের মাথা।'

এই উপন্যাসে ছোটমামার এই ব্যক্তিবিশ্বাসের জয়গাঁথাই গীত হয়েছে— কোনো শাস্ত্র বা গুরুর নির্দেশ নয়, সাধারণ মানুষ যে অজ্ঞাতসারেই অনেক জনদরদী কাজ করে, এবং তাতেই মানুষের মুক্তি সম্ভব হয়, ছোটমামার ভিতর দিয়ে এই সত্যই প্রমাণিত করেছেন রউফ। সাধারণ মানুষের প্রতি রউফের যে-ভালোবাসা ও বিশ্বাস পরবর্তী সময়ে দীপ্ততর, তীব্রতর ও আরো-সোচ্চার হয়েছে, 'পরদেশে পরবাসী' উপন্যাসেও তার স্বাক্ষর মিলে। সাধারণ মানুষের প্রতি রউফের আত্মার যে কি টান ছিল; তা প্রকাশ পেয়েছে রূপমিয়ার উক্তিতেই—'আমার ভাবনার জগত জুড়ে স্থান করে নিয়েছে [...] গ্রামের লোকগুলি। [...] তাদের আত্মার টান আমার জন্য কত গভীর, [...] মনটা ভেতরে ভেতরে স্নেহ-উচ্ছ্বসিত-আবেগে ভরে উঠল। [...] গ্রামের অনেক লোকের সঙ্গেআমার ব্যক্তিগতভাবে পরিচয়। তাদের এই প্রাণের টান আমাকে লৌহকঠিন একাত্মার বন্ধনে আবদ্ধ করল।'

ছোটমামার বিনয়, সহিষ্ণুতা প্রায় পাড় ঘেঁষে বয়ে চলে যখন 'সল্প আয়ের শ্রমিকের পক্ষে আরেকটা পেট-পালা' অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাস্তব পরিস্থিতির মোকাবেলা করতেই রউফ এ-কথাগুলির স্থান দিয়েছেন। তবে আশ্চর্য সহিষ্ণুতা শেষ-পর্যন্ত ছোটমামাকে করেছে বিজয়ী, অসাধারণ সহিষ্ণুতা বলেই তিনি দখল করেছেন ভাগ্নের মনটি। উপন্যাস শেষ হয়েছে এই পরিষ্কার আশা-বাণীতে, 'নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে

মাফ করিয়া দিলাম ।' মানুষ, জীবন ও নিজের প্রতি বেঁচে থাকার বিশ্বাস ও তাগিদে ছোটমামা সবচেয়ে ভালো উপায় খুঁজে নিয়েছেন ।

মইন ও মীনা—

মীনার প্রতি মইনের একটিনা আকর্ষণই এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে । এই আকর্ষণের সূচনা হয়েছে দীর্ঘদিনের প্রেমের মাধ্যমে । তারপর ক্রমাগত মাইন ঝুঁকে মীনার দিকে— শেষ পর্যন্ত বিয়ে । মইন বলে, '[...] একটি প্রেরণা আমার মনটাকে বিলেত থেকে টেনে স্বদেশে নিয়ে গেল । [...] সঙ্গিনী একজন জুটল, তাতেও খড়-কাঠ পুড়াতে হয়েছে অনেক । আগেই পরিচয় ছিল, তবে এবার সে বড় হট করল । পরবাসীকে বিয়ে করতে সে চায়নি, দীর্ঘ বিরহের আশংকায় ।'

ডাক পিয়নের সঙ্গেমীনার অশোভন সম্পর্কের পরও মইনের আকর্ষণ কমেনি— বরং সে যেন মরীয়া হয়ে ওঠে মীনাকে পাবার জন্য । যদিও খানিকটা অবুঝ অভিমান মনের মধ্যে উদয় হয়েছে তবুও মূলত মীনার প্রতি মইনের দুর্নিবার আকর্ষণেই বিলেতে নিয়ে আসতে চায় সে । সে-জন্যেই সোজাসুজি দাবি করে—'পুতুল আমার পুতুল' । অবুঝ অভিমান যে তখনও ছিল তার প্রমাণ মইনের উক্তি—'সবই আমার সামনে ফাঁকা; জীবনটা যেন একটি ফাঁকি ।' কিন্তু এই অভিমানের অন্তরালে যা কাজ করেছে তা হচ্ছে মীনার প্রতি মইনের অতি তীব্র আকর্ষণ— প্রেম ও যৌনতায় মিশাল অতি তীব্র আকর্ষণ । মীনাও কিছুতেই মইনের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারেনি । মইন দেশে গেলে মীনা তারই হাত ধরে বিলেতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায় । রউফ প্রবাসী মইনের গার্হস্থ্য জীবনের প্রবল আকর্ষণেরই উপাখ্যানের স্থান করে দিয়েছেন এই উপন্যাসে ।

মীনাকে দিয়ে এই উপন্যাসে নারী মনের কামনা-বাসনার জয়গান বিঘোষিত হয়েছে । মানুষের জৈবিক বৃত্তি সম্রাজ্যের চেয়েও বড় । পক্ষাঘাতগ্রস্থ দুর্বল বিলেতি স্বামী মইন যখন বিলেতে তখন স্বামীর অনুপস্থিতে স্ত্রী মীনা মুক্ত নারীর মত স্বামীর পত্রবষ্ঠনকারীর– সবল, আদিম রক্ত সঞ্চলিত, সঙ্গেদেহ-সমপন ও যৌন সঙ্গমে আবার মুক্তি খুঁজে পায় । রউফ এ-উপন্যাসটিতে বোঝাতে চেয়েছেন— দেহ কামনাকে বাদ দিয়ে আবার বিকাশ অসম্ভব । মীনা ও ডাক-পিয়নের ভাবী সন্তানকে আসন্ন সমাজের প্রতীক রূপে ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে নারীর সহজাত পরিণতি মা হওয়ার মাধ্যমে । মা হবার ক্ষুধা মেয়েমানুষের জন্মগত তৃষ্ণা । দৈহিক মিলন ছাড়া এ ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্যকোন উপায় নেই, অথচ স্বামীর সঙ্গেমীনার সাত-সমুদ্র তের-নদীর সম্পর্ক । তাদের মধ্যে দেহ-সম্পর্কের কোন যোগাযোগ অসম্ভব । অথচ মীনার তৃষ্ণিত অন্তর চায় আপনার প্রাণের ভিতর আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ অনুভব করতে ।

দিলদার—

দিলদারের পরিচয় জ্ঞাপন করতে প্রথম বাক্যেই বলা হয়েছে—'দিলদারের ভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতি ।' দিলদারের সঙ্গেরূপমিয়ার বিমিশ্র সম্পর্ক । রউফ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন দিলদারের জবানিতে—'আমাদের বন্ধুত্ব ছিল সর্বজন প্রশংসনীয় । লোকে বলাবলি করত— আহা! কেমন মানিক জোড়া । এহেন বন্ধুত্ব রক্ষার জন্যে আমার ত্যাগ ও তিতিক্ষারের কথা শুনবেন কি আপনারা?'

তাদের বন্ধু-সম্পর্ক অনেক জটিল ও পরিবর্তনশীল । প্রথমদিকে যেমন শেষে তাদের সম্পর্ক আমূল পাল্টে যায় । তাদের জয়-পরাজয়ের কাহিনী রউফ পরতে-পরতে উন্মোচন করে দিয়েছেন । চাকরির সন্ধানে রূপমিয়াকে আসতে হয় দিলদারের আশ্রমে । দিলদারের ব্যবহারে রূপমিয়াকে তার আশ্রম ত্যাগ করে চলে যেতে হয় । দিলদারকে আঁকা হয়েছে— কামে, ক্রোধে, ঈর্ষায়, হিংসায় সে একজন মানুষ । সে ধুরন্ধর, ভণ্ড, সাধারণ মানুষ । এক হিশেবে দিলদার ভণ্ডই বটে, কেননা, রূপমিয়া বলে—'অভারকোর্ট

খোলার সঙ্গেসঙ্গেতার চেহারাও পাল্টে গেল।... দিলদার আলির এই বেশ-ভূষায় অন্তরের সত্য-পরিচয় গোপন রাখতে পেরেছে বলে বাহবা পাবার যোগ্য। পৃথিবীর ভালো দিকটা যেন এ মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক। আমার চোখে তার কুলষিত অন্তর কলঙ্কিত তারার মত ধপধপ করে আত্মপ্রকাশ করল।'

নাসরিন—

নাসরিন যখন রূপমিয়ার সামনে এসে প্রথম দাঁড়ায় তখন সে 'এক হুরি না অপ্সরী, বোঝার অনুভূতি হারিয়ে' ফেলে সে। নাসরিনকে দেখে রূপমিয়ার মনে হয়েছে সে যেন 'কুমারী পূজোর প্রতিমা'। নাসরিনের মুখে 'সর্বাঙ্গণ শিহরণ জাগানো হাসি'। সে হাসিতে শুধু আছে 'চাঁদের স্মৃত আলো'। এভাবেই রউফ নাসরিনকে নিয়ে 'গল্পের ঝুঁপির মুখ খুলে' দিয়েছেন। তারপর আস্তে আস্তে উন্মুক্ত করেছেন রূপমিয়ার মনে জাগ্রত দ্বন্দ্বগুলিকে। যেমন, রূপমিয়া দেখে নাসরিন তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। চোখ ঘোরাতেই দৃষ্টি গিয়ে ঠেকায় নাসরিনের বুকে। রূপমিয়া বলে—'যেখানে সিল্কের শাড়ি আর ব্লাউজের নিচে দু'টো বোঁটা গর্বভরে আত্মপ্রকাশের জন্য উদগ্রীব। মানশ্চক্ষু তাদের সৌন্দর্য অবলোকনে ব্যস্ত। চর্মচক্ষু তাদের ভেতরের মধুভাণ্ডারে ডুব দিল।... আমার সামনে আসীনা সুনয়না শাড়ির পাড় ডান স্তনের মাঝখান দিয়ে বক্রাকারে এমন কলা-কৌশলে পরিধান করেছেন যে, তা সত্যিই প্রাণিধান যোগ্য। রঙধনু যেমন শারদীয় বিকেলে পূর্বাকাশের শোভা শতগুণ বাড়িয়ে দেয়, তেমনি দেবীর শাড়ির বিবিধ রঙের পাড়ের সঙ্গে ব্রা-ব্লাউজ ফুটে বের হয়ে আসতে লালায়িত।' প্রসঙ্গক্রমে রউফ শান্ত ও সুষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন নাসরিন ও তার স্বামীর বন্ধুকে ঘিরে সমস্যার কথা। বন্ধুর ষড়যন্ত্রের কথা। সচেতন বাস্তব-দৃষ্টিতে একাকী লড়াইরত একটি নারীর ত্রুটির কথা। রউফ লক্ষ্য করেছেন জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে কিভাবে স্বাধীনচেতা নারীর পথচলা বিপদগামী হয়ে পড়ে। নাসরিন চরিত্রের মাধ্যমে রউফ প্রবাস-জীবনে নারীদের অবস্থা-সমস্যা-চিন্তার সঙ্গে বিশ্লেষণও, সমাধানও।

জাবেদ—

বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে রউফ তার আরো গভীরে প্রবেশ করেছেন। এই প্রবেশের জন্যেই বোধহয় সৃষ্টি করেছেন জাবেদ চরিত্রটিকে। রূপমিয়ার সঙ্গেজাবেদের প্রথম পরিচয় ঘটে— রূপমিয়ার শোবার কামরার এক কোণে। একটি 'ওয়াস বেসিন' তার উপরে 'একখানা আয়না' আঁটা তার সামনে। সকালে সেখানে দাঁড়িয়ে এক যুবক সেইভ করছে। 'বয়স বিশের বেশি হবে না। সর্বঙ্গে যৌবন। স্বাস্থ্যে ও রূপে পরিপূর্ণ। গোলগাল মুখ। নাদুসনুদুস শরীর। অবাঙালি সুলভ ফর্সা। হয়ত গৌরির গর্ভে, বাঙালির ওরসে জন্ম।'

এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে রউফ সুনিবার্চিত ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগিয়েছেন। এগিয়েছেন মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকায়। বিশ্লেষণ করেছেন গৌরির গর্ভে জন্মা যুবকের মনস্তত্ত্ব, দ্বন্দ্ব-যন্ত্রনা ও সামাজিক অস্থিরতাকে। জাবেদ যখন আবিষ্কার করতে সমর্থ হয় তার জন্মরহস্যকে তখনই রউফ এই উপন্যাসের সরজমিনে প্রাধান্য দিয়েছেন মানুষের সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক আদিম বৃত্তিকে— যৌনবৃত্তিকে। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে রূপমিয়াকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন, 'এখন সময় এসেছে নতুনত্বের; জীর্ণ-পুরাতন ফতোয়ার বন্ধ জালে আবদ্ধ সমাজকে ভেঙে নতুনত্বের জোয়ারে ভাসিয়ে দেবার।' কারণ, 'ফতোয়ায় ঔদার্য ও মহত্ত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সত্য প্রকাশেই সমস্যা।' তাই তো এই 'অবাঞ্ছিত, অপ্রয়োজনীয়, বিবেকহীন, মানবধর্ম পরিপন্থী, অবান্তর, অশ্লীল ফতোয়ার প্রয়োগ উপযোগী সমাজ ব্যবস্থায় অবসারণ ঘটেছে বহু শতাব্দি আগে।'

রউফ গ্রহণ করেছেন এমন এক শিল্পী-নীতি যা মানুষের দেহ ও অন্তর-আত্মার বিচিত্র রহস্যের অতল সমুদ্র। যেহেতু মানুষই একমাত্র সামাজিক জীব— তাই তার দেহ ও অন্তর-আত্মার রহস্য আর সচেতনতা ও সামাজিক সম্পর্কের উপর প্রতিফলিত না-হয়ে পারে না। মানুষের পক্ষে দেহ ও অন্তর-আত্মা কোনটাই উপেক্ষীয় নয়— পরস্পর নির্ভরশীল, একে অপরের পরিপূরক। রউফ এ দু'য়ের স্বীকৃতি আর সমন্বয়ের শিল্পী। তিনি অন্তর-আত্মা ও দেহ কোনটাকেই খাটো করে দেখেননি। অন্তর-আত্মাকে বাদ দিয়ে দেহকে শুধু কল্পনা করা যায় না। তাই রউফ বলেছেন, 'রক্ত-মাংসের মিলনটাই সত্য।' রক্ত-মাংসের অনুভূতি ও বিশ্বাসের ফলে যে মিলন ঘটে তাকেই রউফ বলেছেন 'পাপমুক্ত ও ভ্রান্তিমুক্ত'। এই মতবাদ অধিকভাবে প্রাধান্য পেয়েছে এই উপন্যাসে।

রউফের চরিত্র সৃষ্টির একমাত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনুভূতি বোধশক্তি। রউফ গভীরভাবে এই পৃথিবীর রহস্যকে উপলব্ধি করেছেন আর এ রহস্য তাঁর কাছে একটি আকাঙ্খার স্বর্গরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। রউফ অল্পের জন্য হলেও মানুষের নিভৃত অন্তরের আকাঙ্খার কথা ভুলতে পারেন নি; যা সাধারণ মানুষ ভুলে থাকার ভান করে। এই বিশেষ অনুভূতি তাঁর অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গেমিলে যা সৃষ্টি করেছে তা হচ্ছে অপরূপ দ্রোহী কথাশিল্প। এ সূক্ষ্ম অনুভূতি বোধই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বা অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন, তিনি এই বিশেষ অনুভূতিতে পূর্ব থেকে সচেতন এবং তাঁর দান এ ক্ষেত্রে অসীম। 'পরেদেশে পরবাসী' উপন্যাসে রউফ নরনারীর জৈবিক সম্পর্ককে স্বাভাবিক রূপ দিয়েছেন। কারণ, নরনারীর প্রকৃতি-সৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা যায় না, তাহলে যে প্রকৃতিকে অস্বীকার করতে হয়। সৃষ্টির নিয়মকে অবহেলা করতে হয়।

গ্রাম-বাংলার কথা

সময় ও সমাজ বিবর্তনের অনিবার্য টানে গ্রাম-বাংলার জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য লালিত জীবনের রূপান্তরের সত্য উন্মোচিত হয়েছে রউফের এই উপন্যাসে। এ-উপন্যাসে গ্রাম অঞ্চলের জীবনের অন্তর-বাহির, কুসংস্কার-বিশ্বাস, প্রত্যাশা-অচরিতার্থতা, শোষণ-বঞ্চনা, সংগ্রাম-শীতলতা প্রভৃতির বিন্যাস ঘটেছে। ঔপন্যাসিকের জীবনবোধের সমগ্রতার প্রতিফলনে বিশেষ আঞ্চলিক ভূখণ্ডের অস্তিত্ব-সংরাগ সর্বজাতিক অভিপ্রায়ের সামীপ্য লাভ করেছে।

শ্রেণী-শোষণ, ধর্ম-শোষণ ও সামরিক-শাসনপীড়িত সময়খণ্ডে রউফ দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের অধিবাসীর ইতিহাসের ঊষা-লগ্নের আগ মুহূর্তকে উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন। তাঁর এই বিষয় সন্ধানের মূলে সক্রিয় ছিল শিল্পী-সত্তা ও মানব-সত্তার সর্ব-বন্ধন-মুক্তির আকাঙ্খা। ইতিহাসের পটে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বর্তমানকে। আর প্রতিবাদী চেতনা প্রকাশের এ এক আধুনিকতম শিল্পক্রিয়া। ধর্ম ও শাস্ত্র-আচার-বিরোধী জীবন-আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদী চেতনার উপস্থিতি সুস্পষ্ট।

দেশের প্রতি রউফের মন ও আত্মার যে কি পরিমানের টান তা প্রকাশ করতে একটি বাক্যের উদ্ধৃত করা প্রয়োজন—'একমাত্র বেদুইনই থাকতে পারে মরু হৃদয় নিয়ে। বেদে তা পারে না। বেদের জন্যে প্রয়োজন নদী, জল, মুক্ত বাতাস। তাই বাঙালির জন্যে প্রয়োজন নদী, জল আর শস্য-শ্যামল বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ।'

রউফ গ্রাম বাংলার যে দৃশ্যে এঁকেছেন তা অকৃত্রিমতায় ও আন্তরিকতায় ভরপুর। ভেতরে সহজে প্রবেশ করা যায়। মনে, মননে ও মগজে দাগ কাটে। প্রত্যেক মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়। এসব চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি গ্রামের লোকদের কথাও বলেছেন। বলেছেন তাদের খাদ্য নেই, সুস্বাস্থ্য নেই— তারা একান্ত অসহায়। তাদের সেই বেদনা, সেই অসহায় ভাব রউফের অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছে। এসবের বিশ্লেষণ নিচের উদাহরণগুলিতেই সুস্পষ্ট–

১. 'মশার-মা বুড়ি তামাক খায়। দু'তিন বার রাতে। ঘুম থেকে জেগে। দিয়াশলাই দিয়ে টিকিয়া জ্বালানো এক ঝামেলা, তাই আলিয়ায় একটি টিকিয়া রেখে দেয়। তামাক সাজাতে সাজাতে টিকিয়া লাল হয়ে যায়। বুড়ির তামাকে বড় নেশা। রোজা রেখেও তামাক খায়।'

২. 'একদিন বাড়ি ফেরার পথে শাড়ির মত করে গামছা পরা জহোরা মেয়েটিকে একা পেয়ে মুর্তাবনে নিয়ে গিয়ে গৃহপালিত পশুর রতিক্রিয়া দেখে শেখা যৌনক্রিয়া সম্পাদন করার ব্যর্থ চেষ্টায় দিলদার প্রস্রাব করে ফেলে। উরুতে লেপটে থাকা ভিজা গামছা স্বচক্ষে দেখে মিয়াসাব পরদিন দু'টো মুর্তা ভেঙে নিলেন দিলদারের পিঠে।'

৩. 'আমার বাড়ির উত্তর পাশে একটি অগভীর বিল ছিল...। হেমন্তকালে সেটা হত গ্রামের গোচারণ ভূমি, আর বর্ষাকালে হাঁটু জলে মাছ ধরার খেলা বসত। বৈশাখী ঢলে আশপাশের পুকুরগুলি থেকে আসাত কই-চ্যাঙ, শিঙ-মাগুর। পশ্চিম অংশ অপেক্ষাকৃত গভীর ছিল বলেই কোমর পানি থাকত। তাতে চ্যাঙ, শইল, গজার মাছের পোনা কচুরি পানার ফাঁকে ফাঁকে সেনালী রঙের লুকোচুরি খেলা করত। সে খেলা দেখে নিষ্ঠুর লোকগুলি উকা কাঁধে নিয়ে যমরূপে হাজির হত।'

৪. 'ছোটবেলার সেই বানাইয়া হাওড় এখন আর নেই, দৈর্ঘে-প্রস্থে ন'মাইল-ছ'মাইল ছিল, কালনিরচর থেকে হরিপুর পর্যন্ত; বিরাট-বিপুল-বিচিত্র তার রূপ। 'নীলুয়া বাতাসে মাঝি পাল উড়াইয়া দে, মাঝি পাল উড়াইয়া দে', 'পবনের মায়ের পুঁদে তালি, পবন ওঠে জ্বলি জ্বলি' ইত্যাদি বলে পবনকে উত্তেজিত করা হত, যাতে নীলুয়া-বাতাস এসে পালে ভর করে।'

৫. 'জননী জন্মভূমির নীলুয়া আকাশ-বাতাস, সবুজ-শ্যামল বনানী-প্রান্তর, শান্ত জল-তরঙ্গ হঠাৎ বন্ধন টুটে গিয়ে প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে নিয়ে আসত 'সৃষ্টি সুখের উল্লাস'। মনে হত এই বুঝি তরঙ্গচঞ্চল হাওড়ে শুরু হচ্ছে শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, ভাগ্যহত মেহনতিদের জেগে ওঠার জয়গান; শোষণমুক্ত সমাজের পত্তন।'

প্রতীক

রউফ তাঁর সব ক'টা উপন্যাসে প্রতীকের প্রয়োগ করেছেন। বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক বলে খ্যাত ছিলেন তিনি, এবং নিজেকেও তিনি তাই মনে করতেন। ফলে তাঁর উপন্যাসের এই প্রতীক প্রয়োগের বিষয়টি অনেক সময় সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

রেলগাড়ি—

'পরদেশে পরবাসী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় কিন্তু অতিপ্রচ্ছন্ন প্রতীক একটি চলন্ত রেলগাড়ি। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই—'ইঞ্জিল সংযোগ করতেই গাড়ি সজীব হয়ে উঠল।' তারপর 'ট্রেন চলতে লাগল একমনে। তার ভাষা আলাদা, গতি-ভাব আলাদা, মেজাজ আলাদা। আশ-পাশের ঘটনার প্রতি একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই তার। দূর পাল্লার রেলগাড়ি কিনা, তাই ছোটখাটো স্টেশনগুলিতে থামল না।' এবং এর পরই, 'রেল-লাইনের উভয় পার্শ্বে গাছ-গাছড়া, ঝোপ-ঝাড়, বন-জঙ্গল। ছন্নছাড়া শীতে আড়ষ্ট। অধিকাংশ নুয়ে। তবু তাদের অস্থিত্বই তো আমায় অবাক করে। রিক্ততার মাঝেও যে সৌন্দর্য, যে আকুলতা তা আমাকে এক নতুন বারতা এনে দিল।'

এই রেলগাড়ি কি জীবনের প্রতীক— রহস্যময় আশ্চর্য জীবনের? এই গাড়ির এঁকে-বেঁকে চলার মতই কি আকস্মিক আবেগে রূপমিয়া, ছোটমামা, ফারনিন, নাসরিন, মীনা, দিলদাররা আন্দোলিত হয়নি বারবার? চলন্ত রেলগাড়ি ও প্রবাহমান-জীবন এই দুয়ের সম্বন্ধ যে নিবিড়, উপন্যাসটির সমগ্র জমিন জুড়ে তা প্রমাণিত হয়েছে। উপন্যাসের শেষের দিকে যখন রূপমিয়া নিজের বাড়ি কেনে তখনও রেল-লাইনেরই

পাশে কিনেছে। রউফের এই প্রতীক ব্যবহার আমাদের জন্য বয়ে এনেছে বিপুল বিস্ময়। মোটা হরফে তিনি স্থাপন করেছেন একদিকে চলন্ত রেলগাড়ি আর অন্যদিকে প্রাবস-জীবনের গ্লানি ও অনুতাপ।

সূর্য—

অসহায়, বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, সামাজিক অবিচার ইত্যাদি ব্যক্ত করার জন্য রউফ সূর্যকে প্রতীক হিশেবে ব্যবহার করেছেন। তৈরি বক্তব্যের শিরা-উপশিরা দিয়ে লেখকের কল্পনা ও হৃদয়ের উত্তাপ বাহিত। কল্পনার পরিচয় অবশ্যই ধরার পড়ে প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এ-সবের বিশ্লেষণ নিচের উদাহরণগুলিতেই সুস্পষ্ট—

১. 'জানালা পথে যেটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছে তা বেশ পরিষ্কার। সুর্য দেখা না-গেলেও তার জ্যোতি অনুভব করা যাচ্ছে।'

২. 'লন্ডনে ভোরের সঙ্গেসূর্য উঠার কোন সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ অফিসার-পুত্রের মত শ্রমবিমুখ এ সূর্যদেব। মদ খেয়ে ঘুমিয়েছে কিনা! জেগে উঠার নামগন্ধ নেই।'

৩. 'এককালে বলা হত— বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। আজ সেদিন আর নেই, সে মধ্যাহ্ন সূর্যও নেই। এখন খোদ ইংরেজের দেশেই সূর্যোদয় হয় না। এ অসহনীয় দুঃখ ভারাক্রান্ত অন্তরে ইংল্যান্ডের আকাশ অজস্র আঁখি দিয়ে অনবরত অশ্রুপাত করছে। তবু কি দিবাকরের অভিমান ভাঙে!'

৪. 'আজ পাঁচ সপ্তাহ শেষ হতে চলল লন্ডন এসেছি। কিন্তু সূর্যের মুখ এখনও দেখতে পারিনি।'

৫. 'সূর্যদেব যে খোদার আরশের নিচে বিশ্রামে গিয়েছিলেন নভেম্বরের শেষের এক সন্ধ্যায়; সে কুম্ভকর্ণের ঘুমের যেন আর শেষ নেই।'

৬. 'বিলেতি সূর্য অনেক আগেই অস্ত গিয়েছে। সন্ধ্যা ছায়ায় ঘরটা ঝাপসা।'

সব শেষে বলল, রউফের জীবন-দর্শন ও শিল্প-অভিপ্রায়ের মূলে যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের ক্রিয়াশীলতা সন্দেহাতীত। এ-সত্যও উল্লেখযোগ্য যে, 'পরদেশে পরবাসী'র বেশির ভাগ বিলেতেই লিখা। সম্ভবত এ-কারণেই এক নিরাসক্ত সত্যদ্রষ্টা শিল্পীর ঐকান্তিকতায় তিনি সমাজ-সত্যের অন্তঃপ্রদেশ এবং মৃত্তিকামূলস্পর্শী জীবনের নিগূঢ় ইতিহাসকে শিল্পরূপ দানে সমর্থ হয়েছেন।